Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 229 - 235
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 229 - 235
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

গৌরকিশোর ঘোষের উপন্যাসে প্রান্তিক হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক, সংঘাত ও সমন্বয়

ড. মুঈদুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়
Email ID: mueedul.islam@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Hindu-Muslim, Margin, Relation, Conflict, Humanity, Communal, Class, Politics.

Abstract
As we know, Bengali Hindu-Muslim are ethnically one. Because most Bengalis are Muslim converts. And it is well known that the lower caste Hindus converted to Islam for various reasons. As a result, the Bengali Muslims we see today have Hindu blood in their traditions. Hence there is a cordial relationship between Bengali Hindus and Muslims. But this relationship deteriorates due to various reasons. Its main host is politics and upper class society. We see this in Gourkishor Ghosh's novel. In his 'trilogy' we will see the hardy relationship and separation of marginalized Hindu-Muslims - the silent separation. It is mainly the educated middle class community that is responsible for this. This context is prevalent in the first novel of the trilogy 'Jal Padhe Pata Nade' (1959). Just as the Hindu-Muslim community is bitterly scornful of each other over moral reforms, so too is the private quarrel over the collection of taxes gradually turning into a communal conflict. There are also cases of 'caste' disappearing by drinking a pot of water. Again, there are examples of both Communities moving together, living and eating together. Just as there are examples of a kalkeya (hunko) pulling two people together, there is also a custom of drinking tea together. Yet, 'water falls and leaves move' is the record of how communalism has been created by suspicion and mistrust between the two communities. In 'Prem Nei' (1981) the heart-to-heart relationship of a marginalized Hindu-Muslim emerges. The picture of how Sajjad-Bashir-Gyar has 'cracked' about Hardik is also clear. In 'Prateveshi' (1995) the treatment of the upper class towards the lower class seemed

to the author to be a 'humiliation of humanity'. Here he highlights biracialism and Hindu-Muslim mutual relations. He showed that there is no difference between marginalized Hindus and Muslims. But recently educated upper and middle class society and politics have infused them with hostility. Which is the biggest tragedy of our subcontinent.

Discussion

'কবহুঁ মিসিমিল কবহুঁ সন্দেহাঁ'- অতীতে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান এভাবেই জীবন কাটিয়েছে। সরাসরি সংঘাতের পথে কখনো আসেনি। বৈরি মনোভাব মাঝে মধ্যে তৈরি হয়েছিল বটে, তথাপি তা ধর্মের জন্য নয়; সামাজিক অধিকার আদায়ের লক্ষে। হিন্দু সমাজের 'চতুবর্ণ' প্রথা তথা বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার হাত থেকে নিস্তার পেতে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে 'সাম্যবাদী' ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। যেসব স্থানগুলোকে ব্রাহ্মণরা ব্রাত্যদের দেশ আর বৌদ্ধপ্রধান দেশ বলে 'ব্রাহ্মণ বর্জ্জিত' স্থান হিসেবে ঘৃণা করত, সেই সব স্থান আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমান প্রধান। মহাভারতের কর্ণ পর্বে গান্ধার (পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব আফগানিস্থান), পঞ্চনদ, মদ্রক, সৌবির (সিন্ধ) প্রভৃতি দেশকে ব্রাহ্মণ-বাস অযোগ্য বলা হয়েছে। মনুতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অধিবাসীদের 'দরদ' ও 'ব্রাত্য' বলা হয়েছে। বাংলাকেও বলা হয়েছিল 'ব্রাহ্মণ বর্জ্জিত' দেশ।[১] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এ সকল দেশই আজ মুসলমান প্রধান। অথচ মুসলমান আক্রমণকালে এসব দেশেই ব্রাহ্মণধর্মীয় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই ধর্মান্তরিত প্রান্তিক হিন্দু-মুসলিম একই সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করতেন-

> "মুসলমান বলিয়া আমরা ইহাদিগকে ঘৃণা করিতাম না, ইহারাও আমাদিগকে 'কাফের' ভাবিয়া নরকে পাঠাইতেন না; উভয়ে নিষ্ঠা সহকারে নিজ নিজ ধর্ম পালন করিতেন।"[২]

হিন্দুদের যারা মুসলমান হতে লাগলো, তারা পৃথক সমাজ গড়ে তুললেও পুরুষানুক্রমিক অভ্যাস ও রীতি ত্যাগ করতে পারেনি। কোনো দেশের মুসলমানই তা পারেনি। ফলত, বিশাল ভারতীয় হিন্দু সমাজের একাংশ কর্তিত হয়েই নতুন মুসলমান সমাজ গঠিত হয়। অবশ্য ধর্ম-পুরোহিতেরা অনেকে বিশ্বাস ও রীতি নীতির পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তথাপি ভারতীয় মুসলমান সমাজে ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্টভাবে আজও বিরাজ করছে। আমেরিকান অনুসন্ধানকারি এফ.স্টাইমাস তাঁর সিদ্ধান্তের শেষে স্বীকার করেছেন, 'ইসলাম হিন্দুধর্মকে যত না প্রভাবান্বিত করেছে হিন্দুধর্ম ভারতে ইসলামকে তদপেক্ষা অনেক বেশী প্রভাবান্বিত করেছে'। গৌরকিশোর ঘোষের ট্রিলজি-তে সর্বত্র এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সফিকুল (ফটিক) মেজকত্তাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। এ তো 'ভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্য'। তাই মৌলবি সাহেব রেগে গিয়ে চিৎকার করে বলেন—

> "সাচ্চা মুসলমান খুদাকে সিওয়া আউর কিসিকে সামনে সর, নেহি ঝুকাতে। কিউ মিঞা তুম মুসলমান হো কর ইতনা নেহী জানতে হো।"[৩]

আবার নজরুল ইসলামের মতো কবি 'হিন্দুয়ানী ভাবে গদগদ হইয়া গাদাগাদা গান কবিতা এন্তার লিখ্যা' গেছেন। কিন্তু 'রবীন্দ্রনাথ তো মুসলমানী থিম লইয়া কবিতা ল্যাখেন নাই'। এর উত্তরও গৌরকিশোর এভাবে দিয়েছেন, 'হিন্দুর ঐতিহ্যে নজরুল তথা মুসলমানের উত্তরাধিকার রয়েছে, কিন্তু মুসলমানের ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথের তথা হিন্দুর উত্তরাধিকার নেই'। সত্যিই তো ভারতবর্ষের মুসলমানরা সবাই যে বিদেশ থেকে এসেছে এমন তো নয়। বেশিরভাগ ভারতীয় নিম্নবর্গের হিন্দুরাই ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে। আর এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, প্রান্তিক তথা নিম্নবর্ণের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে গভীর হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে হিংসা, রেষারেষি নেই। নাড়ীর টান রয়েছে একে অপরের। এদের মধ্যে 'ভেদরেখা' টেনে দিয়েছেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। যার ফল এখন সমগ্র ভারতবাসীকে দিতে হচ্ছে।

উনিশ শতকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে উচ্চবর্গ হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটে এবং বিশ শতকে তা ব্যাপক আকার ধারণ করে। অন্য ধর্ম ও বর্ণের মধ্যেও তা বিকাশ লাভ করে। ১৯০১ সালের গণনানুযায়ী দেখা যায়, বৈদ্যদের

মধ্যে শিক্ষার হার দাঁড়িয়েছিল শতকরা ৫৩ জন। সাধারণভাবে হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার হার ছিল ১১ শতাংশ। কিন্তু মুসলমান এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে এর হার ছিল খুবই কম। তারপর শতাব্দী যত এগিয়ে যেতে থাকলো, গ্রামে-গঞ্জে, মফস্বল শহরে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার তত প্রসার ঘটলো। ফলে সম্পন্ন মুসলমান, নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও শিক্ষার সুযোগ পেল। 'ভেদরেখা' প্রবল হল। প্রতিযোগিতায় একে অপরের পরাস্তে মেতে উঠলো। 'নিম্নবর্গে'র প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণি।

গৌরকিশোর ঘোষের 'ট্রিলজি'তে আমরা দেখতে পাবো প্রান্তিক হিন্দু-মুসলমানের হার্দিক সম্পর্ক এবং বিচ্ছেদ-নীরব বিচ্ছেদ। এর জন্য দায়ি প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। ট্রিলজির প্রথম পর্ব 'জল পড়ে পাতা নড়ে' (১৯৫৯) উপন্যাসে এই প্রেক্ষাপট যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের আচার-সংস্কার নিয়ে একে অপরের প্রতি তীব্র কটাক্ষ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে খাজনা আদায় করতে গিয়ে একান্ত ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ক্রমে গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বে পরিণত হওয়া। এক পাত্রে জল পান করলে 'জাত' চলে যাওয়ার মতো ঘটনাও বিদ্যমান। আবার উভয় সম্প্রদায়ের একসঙ্গে চলাফেরা, থাকা-খাওয়ার মতো নজিরও রয়েছে। এক কলকেয় (হুঁকো) দুজনের টান মারার মতো দৃষ্টান্ত যেমন আছে, তেমনি আছে একসঙ্গে চা পান করার রীতিও। তবুও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস কীভাবে ঘোঁট পাকিয়ে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়েছে তারই আলেখ্য 'জল পড়ে পাতা নড়ে'।

হিন্দু মাত্রই মুসলমানদের ঘৃণা করবে কিংবা মুসলমান মাত্রই হিন্দু নাম শুনলে তীব্র বিদ্বেষ ছড়াবে, এমন নয়। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' তে আমরা দেখেছি হিন্দু-মুসলমান আপন ভাই ভাইয়ের মতো বসবাস করেছে। মেজকর্তা, ছোলেমান, রামকিষ্টো, নরা, সফিকুল (ফটিক) প্রমুখ ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো সম্প্রদায়গত বিভেদ নেই। মেজকর্তার একমাত্র মেয়ে 'বুড়ি'র সন্তান প্রসব হবে। তাই একটি ঘর বাঁধা হচ্ছিল। 'এখেনকার নিয়ম হচ্ছে, যে ঘরে ছেলেপুলে হয়, সে ঘরটা নোয়ার কামানের দিন ভাঙ্গে ফেলতে হয়। না হলে পোয়াতির উপর দিষ্টি লাগে'।

সেজন্য নতুন একটি ঘর তোলা হচ্ছে। প্রচণ্ড বৃষ্টি। মাটি এক জায়গায় দাঁড়াচ্ছে না। রামকিষ্টো, ছোলেমান, নরা তিনজন অনবরত কাজ করে যাচ্ছে। এদের মধ্যে কোনো 'ভেদ' নেই। ঘরের চালা তুলতে তুলতে রামকিষ্টো জিজ্ঞেস করল, 'এই ছোলেমান, তোগের পাড়ায় সেদিন অত আলো জ্বলতিছিল ক্যান? যাত্তারা হচ্ছিল নাকি?' ছোলেমান বললো-

> "না না যাত্তারা না। মাগরোর পির ছায়েব আয়েলেন। তাই মেদ্দা ছায়েব কলেন, কোরাণ-ছরিফ পাঠ হোক, তাই হতিছিল।.... তা বুঝলে চাচা, পির ছায়েব এমন অ্যাক কছমের নূর রাখিছে দেখলি রামচরণের ছাগলডার কথা মনে হয়। কোরাণ-ছরিফ পড়ার সুময় নূরডা আবার বাহার দিয়ে দিয়ে নাড়ে। ঠিক মনে হয় যেন রামছাগলে কাঁঠাল পাতা চিবোচ্ছে।"[৪]

ছোলেমানের বলার ভঙ্গিতে নরা হি হি করে হেসে ফেলল। রামকিষ্টো তাকে কড়া ধমক দিয়ে জানালো, 'পির মৌলবি গুরু পুরোহিত - ওনারা সব গুনিন লোক'। এঁদের নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করতে নেই। ঘটনাটা এইজন্যে শোনালাম যে, এই প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে কোনো হিংসা, দ্বেষ, ভেদ নেই। এদের কাছে সর্বাগ্রে পরিচয় হলো মানুষ। ছোলেমান অত ভেবেচিন্তেও কথাটা বলেনি। আর রামকিষ্টোও অত-শত ভাবেও নি যে, যাঁকে 'রামছাগল' বলা হচ্ছে তিনি হিন্দু কি মুসলিম, গুরু কি পুরোহিত, না মৌলবি। একজন 'মানুষ' সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা হচ্ছে - এজন্য সে তাদেরকে ধমক দেয়। সর্বোপরি, কতটা আন্তরিক সম্পর্ক হলে এ ধরণের কথোপকথন সম্ভব! আর এই 'আন্তরিক সম্পর্কে' চিড় ধরিছেয়ে কারা? 'জল পড়ে পাতা নড়ে' থেকে আরো একটি উদাহরণ দিই। বুদো ভুঁয়ে ও সুশীল দত্তের তর্কাতর্কি'-

> "বুদো ভুঁয়ে বলে, নাড়ের গায়ে যে রোজ গিয়ে গা ঘষিস, কী পাস, বলদিন। সুশীল দত্ত হেসে জবাব দেয়, ওমা, বুদো দাদা, তাউ জানো না, আতরির বাসনাই। তুমিও দিনকতক ঘষে দ্যাখো না, তুমার গা-র ওই পাঁকের গন্ধ কেমন গুলাপের খোশবা ভুর ভুর করবেনে। বুদো চটে যায়। বলে, অত মাখামাখি ভালো না। একদিন যদি মোল্লা ডাকে ওই মেদ্দা তোগের কলেমা পড়ায়ে না ছাড়ে তো আমার নামে কুকুর পুষিস।"[৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 229 - 235
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সুশীল রাগে না। বরং সে বলে, 'নিজিরডা সামলে রাখো, তালিই আমাগোর ধর্ম্ম রক্ষে পাবে'। হিন্দু হিন্দুর স্বার্থ দেখবে, মুসলমান মুসলমানের। এই মানসিকতা থেকেই তো এসেছে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি। কিন্তু এমন মনোভাব এই অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে পাথরের মতো চেপে বসল কীভাবে? কারা এদের ব্রেনকে ধোলাই করেছে? মেজকর্তার কিন্তু মনে হয়েছে- 'এমন একটা দিন আসবে, যখন, এই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরাই সমস্তরকম সঙ্কীর্ণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে। গোঁড়ামির ধারক বাহক এবং প্রচারক হবে'।

ট্রিলজির দ্বিতীয় খণ্ড 'প্রেম নেই' (১৯৮১)-তে প্রান্তিক হিন্দু-মুসলমানের অভিন্ন হৃদয়ের সম্পর্ক ফুটে উঠেছে। সাজ্জাদ-বশির-গয়ার হার্দিক সম্পর্কে কীভাবে 'ফাটল' ধরেছে, তারও ছবি স্পষ্ট। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' (১৭৯৩) ফলে বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পটপরিবর্তন ঘটে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলার কৃষক সমাজ। এবং এই কৃষক-শ্রমিক শ্রেণি ছিল সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান (মুসলমানদের সংখ্যাই বেশি)। 'প্রেম নেই' উপন্যাসেও আমরা দেখি কিছু হিন্দু জমিদার-মহাজন আছেন। একদিকে গোপাল বিশ্বাস, অন্যদিকে মেদ্দা ছাহেব। এঁরা ক্রমাগত কৃষক-শ্রমিক শ্রেণিকে শোষণ করে চলেছেন। এই জমিদার-আড়তদারদের বিরুদ্ধে সাধারণ হিন্দু-মুসলমান চাষীদের এক করতে উদ্যোগ নিয়েছেন বশির-সাজ্জদ-আবু তালেব চৌধুরী প্রমুখ। গয়া তো সাজ্জাদের সন্তানতুল্য, ফলে সে সবসময় এদের সঙ্গেই থাকে। এমনকি হিন্দু জমিদারদের গোপন বৈঠক (কৃষক-প্রজাদের প্রতি জমিদারদের ভাবমূর্তি) এদেরকে শোনাতে সে কুণ্ঠাবোধ করেনা। বশিরের বাড়িতে কৃষক- খাতকদের বৈঠক বসেছে। বক্তা মৌলবি আবু তালেব চৌধুরী। তিনি প্রত্যেক বক্তৃতার শুরুতেই গেয়ে যান, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম্', 'ভাই মুসলমান কৃষক ও খাতকগণ', 'বঙ্গের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ .... আজ হিন্দু সকল স্থানেই প্রধান, মুসলমান সকল স্থানেই গোলাম', 'বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে বঙ্গে তিন কোটি মুসলমানের বাস', 'ভাই মুসলমান, আইস, আজ একই কেন্দ্রে আমরা একত্রিত হই'। এবং শেষ করেন 'মোনাজাত' দিয়ে। আর এতেই বিপত্তি। যেখানে হিন্দু-মুসলিম কৃষক-শ্রমিক শ্রেণির মজলিশ, সেখানে কেবল 'ভাই মুসলমান', 'ভাই মুসলমান' করে গলা ফাটানো সত্যিই অপ্রীতিকর। গয়া এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করে জমিরুদ্দিকে সাবধানও করেছিল-

> "দ্যাখ, একটা কথা কই, কিছু মনে করিসনে। সব সুময় তুরা যদি হিন্দু হিন্দু আর মোছলমান মোছলমান করিস, তা'লি হয় কি, ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়।"[৬]

বশিরেরও কতকটা টনক নড়েছে। তবে বড় দেরিতে। ততদিনে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। সেদিন বাঞ্ছারাম ও মোতেকে জমায়েতে আসার জন্যে বলতে গেলে মোতে বলে, 'তুমাগের ব্যাপারে আমরা যায়ে কী করব'? মোতের কথা শুনে বশির তো অবাক -

> "তুমরা আমাগের মোছলমান করার মতলব আঁটিছ শুনলাম। আমি বললাম সে কী? এই জমায়েত ডাকা হইছে চাষী আর খাতকগের জমিদার আর মহাজনের অত্যাচারে থে রেহাই পায়ার উপায় ঠাওরাবার জন্যি। তখন মোতে মাথা চুলকোয় আর কয়, তাই না কি, তাই না কি? তা তো জানতাম না। আচ্ছা যাবো।"[৭]

ইতোমধ্যে হিন্দু মাতব্বররা প্রান্তিক হিন্দু চাষীদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তাদেরকে মুসলমান করিয়ে নেবে- 'খবরদার মোছলমানগের দলে ভিড়ো না। কলেমা পড়ায়ে মোছলমান করি ছাড়বে'। এমনকি এই রটনাও রটিয়ে দিল যে, চাষী খাতকের সমস্যার কথা আলোচনা হবে, এই 'ভড়কি' দিয়েই মুসলমানরা হিন্দুদের ডেকে নিয়ে গিয়ে কলেমা পড়িয়ে 'জাত' মেরে দিচ্ছে। জমিদার মহাজনের 'খয়ের খাঁ'দের এই কথা শুনে অমুসলমান চাষীরা কৃষক-প্রজা আন্দোলন থেকে সরে যেতে লাগল। শেষে এই দাঁড়াল যে, 'এই আন্দোলনের নেতা মুসলমান, অনুগামীরাও মুসলমান। বক্তা মুসলমান, শ্রোতারাও মুসলমান'। গয়ার জীবনে দারুন সঙ্কট এসে পড়ল। কারণ গয়াই একমাত্র হিন্দু ব্যক্তি যে মুসলমান বশির-সাজ্জাদদের সঙ্গে চলে। ফলে হিন্দু সম্প্রদায় সবাই গয়াকে সন্দেহ করে। গোমস্তা তো সরাসরি গয়াকে বলল-

> "এই শালা শুয়োরের বাচ্চা, নাড়েগের সঙ্গে তোর অ্যাত মাখামাখি কিসির! ওগের সঙ্গে হাজত খাটে আ'লি হারামজাদা মুখি অ্যাকটা কথা খসলো না? দারোগা অ্যাতবার করে জিজ্ঞেস করল, হারামজাদা

> তার উত্তর বলতি কী হইছিল যে হ্যাঁ ও বাড়িতি ডাকাতির ষড়যন্ত্র হতিছিল। শুয়োর। তোর মুখির অ্যাকটা কথা খসলি দ্যাখতাম কোন বাপ ওগের জামিন দিত। ... খালি তুই বাপু, আমার পাসে দাঁড়া, ... শালাদের ডাকাতের কেসে ঝুলোবো, রেপ কেসে ঝুলোবো, খুনের কেসে ঝুলোবো। ... কথা যদি না শুনিস তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাবো। দেখি তোর কোন মোছোম্মান বাপ আ'সে রক্ষে করে।"[৮]

গয়া খুব অস্বস্তি বোধ করছে। বড় 'একা' হয়ে গেল। পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়াল যে, গ্রামে তার থাকতে হলে গোমস্তার গোলাম হয়ে থাকতে হবে, বশির সাজ্জাদের বিরুদ্ধে আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দিতে হবে। কিন্তু সেটা তার পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব নয়। কারণ সাজ্জাদ তার পিতৃতুল্য। গদার শিয়রে দাঁড়িয়ে সাজ্জাদ তার কথা দিয়েছিল গয়া তারও সন্তান- 'গয়ার জন্য ভাবিসনে গদা, ও আমার। তোর বাপ নিশ্চিন্দি হয়ে চোখ বুজিছিল'। ফটিকের মাও সাদরে গ্রহণ করেছিল। গয়ার স্বীকারোক্তি- 'আমার মা মরে গেল। তুমি আমারে চাচীর কোলে ফেলে দিলে। চাচী আমারে বুকির দুধ খাওয়াইছে কিনা তুমি কতি পারো'। এহেন পালক পিতার বিরুদ্ধে কীভাবে মিথ্যা সাক্ষী দেবে! গয়া অবসাদগ্রস্ত। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই গ্রামে ৩৪ ঘর হিন্দু পরিবারের মধ্যে কেবল গয়ার ভিটেটাই রয়ে গেছে। আর সবাই এক এক করে ওপারে চলে গেছে। ওপারের মুসলমান পাড়ার লোকেরা এই গ্রামে এসে ঘর বাঁধছে। 'ইডা হচ্ছে ক্যান'? সাজ্জাদের প্রতি গয়ার প্রশ্ন- 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধিখ্যানে চর, য্যান সেই বিত্তান্ত। আমরা কি চরডারে আটকাতি পারিছি'? একটা গ্রাম ভেঙে হলো দুটো গ্রাম- একটা মুসলমানের, অন্যটা হিন্দুদের।

নিম্নবর্গ হিন্দু-মুসলমান চাষী-খাতকদের বাঁচানোর জন্যই আন্দোলনে নেমেছিলেন সাজাদ-বশির-আবু তালেব। প্রজাদের বাঁচাতেই হবে, এমন পণ করেছিলেন। তাদের মনে হয়েছিল হিন্দু জমিদার আর মুসলমান জমিদারে কোনো ভেদ নেই। কিন্তু-

> "হিন্দু বাবুরা আন্দোলন করে, হিন্দু প্রজারা আন্দোলনে আসতে চায় না। হিন্দু বাবুরা বন্দেমাতরম্ করে, আইন ভাঙে, বয়কট করে, বিলিতি জিনিস পোড়ায়, লবণ বানায়, চরকা চালায়, স্বদেশী স্বদেশী করে, বোমা মারে, ইংরেজ তাড়াবার জন্য দলে দলে জেলে যায়, কিন্তু ওদের বলুন, আসুন, আমরা বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা তুলে দেবার জন্য আন্দোলন করি, আসুন আমরা মহাজনী প্রথা তুলে দেবার জন্য আন্দোলন করি, কেননা এতে প্রজারা বাঁচবে, খাতক বাঁচবে, একজন বাবুভাইকেও সাড়া দিতে দেখা যাবে না। বাবুদের মুখে এক কথা, ইংরাজ তাড়ানো আগে, ইংরাজকে তাড়াতে পারলেই কৃষক প্রজার দুঃখু ঘুচবে। কৃষক প্রজা তখন নাকি দেশের রাজা হবে" (প্রেম নেই, পৃ. ২১৮)।

নিম্নবর্গ হিন্দু চাষী-প্রজাদের হৃদয়বেদনা গৌরকিশোর এভাবেই ধরেছিলেন। তাহলে হিন্দু কৃষক-প্রজারা কি বুঝতে পেরেছিল যে, এই বাবুদের আন্দোলনে তাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তনই হবে না? বুঝতেই যদি পারলো, তাহলে 'কৃষক-প্রজা পার্টি'তে যোগ দিলো না কেনো? মুসলমান মুসলমান গন্ধ ছিলো বলে? মুসলমান-মুসলমান গন্ধ থাকবেই বা কেনো? আবু তালেব জানালেন-

> "আমরা কংগ্রেসী বাবুগের দরজায় গিছি, যে-সব বাবুরা কাউনসিলি যায়ে সাহেবগেরে উল্টোয়ে দিতি চান তাগের কাছেউ গিছি, আবার যারা বোমা ছোঁড়েন তাগের কাছেউ গিছি। যাইনি কার কাছে? চাষী যে মরে গ্যালো, খাতক যে ফৌত হয়ে গ্যালো। বাঁচান, এগের দিকি নজর দ্যান। দেশ তো এখেনে। এ কথা কইনি কারে? কিন্তু আফসোস, এই ডাকে আমরা হিন্দু নেতাগের সাড়া পাইনি। আফসোস চাষী খাতকের বাঁচাবার আন্দোলনে, প্রজা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হিদু নেতারা আগোয়ে আসেন নি। বাংলার মুছলমান নেতারাই আগোয়ে আইছেন। তাই আন্দোলনের চিহারাউ এই রকম হইছে।"[৯]

এই কথার উপর আর কথা কি? গয়া চুপ করে গেল। একটা অসম্ভব জ্বালা তার অন্তরকে তোলপাড় করছে। সে বুঝতে পেরেছে 'এই মুসলমান গ্রামে মান মর্যাদা নিয়ে থাকার দিন তার চলে গিয়েছে'।

নিম্নবর্গ পরিবার থেকে হঠাৎ কেউ শিক্ষিত হয়ে উঠলে তারও একটা সংকট তৈরি হয়। গ্রামের নিম্নবিত্ত চাষী সাজ্জাদ মোল্লার ছেলে সফিকুল ওরফে ফটিক কলকাতা থেকে ওকালতি পাশ করেছে। ফলে সেখানকার সংস্কৃতি, বহু

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 229 - 235
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শিক্ষিত মানুষের সংস্পর্শে বেড়ে ওঠা ফটিকের সঙ্গে গ্রাম্য সাজ্জাদ ও চাঁদ বিবির সঙ্গে একটা মানসিক ব্যবধান তৈরি হয়েছিল। সাজ্জাদ মোল্লা নিজের ছেলের সঙ্গে যতটা না আন্তরিক তার চেয়ে ঢের বেশি একাত্মতা অনুভব করতেন গয়ার সঙ্গে। কিন্তু ফটিকের গর্ভধারিণী চাঁদবিবির সঙ্গে এই ব্যাপারটা এত সহজে মেনে নেওয়া সম্ভব? ফটিক নিজেই বুঝতে পারছে বাবা-মায়ের সঙ্গে তার মানসিক দূরত্বের কথা। এইখানে সে অসহায়। সবকিছু জেনে-শুনে, বুঝেও মানসিক ব্যবধান কমাতে পারছে না। স্ত্রী বিলকিসের সঙ্গেও তাই। একেবারে আনকালচার্ড অথচ স্বামীভক্ত। কিন্তু তার জীবনে কোন ওঠা-নামা নেই। গভীরতা নেই। তেজহীন, দ্বীপ্তিহীন সরল-সাদা একজন আদর্শ গ্রাম্য বধূ। স্বামীর সুখ দুঃখ শেয়ার করার মত বিচার বুদ্ধিও তার নেই। ফটিকের বারবার মনে পড়ে মিস্ লতিকা পালিতের কথা, যে তার টিউশনি জোগাড় করে দিয়েছিল। ক্লাসমেট ফটিক-লতিকার মানসিক সম্পর্কও খুব গভীর হয়েছিল। একে অপরকে বুঝতো। বোঝাবার চেষ্টাও করত। কিন্তু গ্রামে বেড়ে ওঠা ফটিক শহুরে লতিকাকে বিয়ের কথা ভাবতেই পারেনি। এ এক বেদনা! 'দিনক্ষণ' পত্রিকায় আবদুর রাউফ লিখেছেন-

> "অসীম দরদ নিয়ে গৌরকিশোর বলেছেন চাঁদবিবির সঙ্গে শিক্ষিত সন্তানের মানসিক ব্যবধানজনিত বেদনার কথা। গর্ভধারিণীর সঙ্গে মানসিক ব্যবধান ঘটে যাওয়ায় ফটিকের যন্ত্রণাও কম ছিল না। কিন্তু দেশকাল পরিস্থিতি অনুযায়ী জীবনধারার পরিবর্তনের অনিবার্য নিয়মের কাছে ফটিক ছিল অসহায়। নিজের স্ত্রী বিলকিসের সঙ্গেও ফটিকের মানসিক ব্যবধান কম ছিল না। জীবনের কোন কোন সংকট মুহূর্তে তার পরিণত মন আর একটা পরিণত মনের সাহচর্য কামনা করত। এর ফলে উভয়েই অনুভব করতে পারত পরস্পরের মানসিক দূরত্ব। অতি নিকট জনের সঙ্গে মনের ফারাক ঘটে গেলে বেদনা অবশ্যম্ভাবী।"[১০]

প্রান্তিক সমাজে এই বেদনার চেহারা কেমন রূপ লাভ করে, গৌরকিশোর অসীম দরদ দিয়ে অনুধাবন করেছিলেন।

তৃতীয় খণ্ড 'প্রতিবেশী' (১৯৯৫) তে নিম্নবর্গের প্রতি উচ্চবর্গের ব্যবহারকে 'মনুষ্যত্বের অবমাননা' বলে মনে হয়েছে গৌরের কাছে। এর জন্য তিনি হিন্দু সমাজকে দায়ি করেছেন। সুধাকরবাবুর বৈঠকখানায় এ নিয়ে বাগবিতণ্ডা চলে -

> "তোমরা তপশীলীদের দাবিগুলোকে নস্যাৎ করে দিতে চাইছ মণিময়? তোমরা বলছ, তপশীলীদের সৃষ্টি করেছে ব্রিটিশ পলিটিক্স। ডিভাইড্ অ্যান্ড রুল। ব্রিটিশ ডিভাইড্ অ্যান্ড রুল পলিসি নিল, আর আমরা হিন্দুরা সুবোধ বালকের মতো উচ্চবর্ণ আর তপশীলীতে ভাগ হয়ে পড়লাম। ... ব্রিটিশ তোমাদের ভাগ করেনি। তোমাদের হিন্দু সমাজ বর্ণাশ্রমের নামে তোমাদের উঁচু জাতে নিচু জাতে ভাগ করেছে। এবং স্পৃশ্য অস্পৃশ্য ভাগ করেছে। পৃথিবীর আর কোনও সমাজে, তা সে সভ্য সমাজ হোক কি অসভ্য সমাজ হোক, এত বড় কলঙ্কের নজির পাবে? মানুষ মানুষকে ছুঁতে চাইছে না ঘৃণায়। কেন? ওর জন্ম নিচু জাতে। মনুষ্যত্বের এত বড় অবমাননা আর কোনও সমাজে আছে?"[১১]

এরই সূত্র ধরে গৌরকিশোর দ্বিজাতিতত্ত্ব ও হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরলেন। জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বকে কি শেষ পর্যন্ত খণ্ডন করা গিয়েছিল? শুধু কি হিন্দুরা এর প্রতিবাদ করেছিলেন? মুসলমানরাও সরব হয়েছিলেন। এর বিরুদ্ধে তীব্র আওয়াজ তুলেছিলেন দেওবন্দের উলামারা। জামায়েত-ই-উলেমা-ই-হিন্দ মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান- জিন্নার এই দাবির বিরুদ্ধে ছিলেন। ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ইসলাম বিরোধী, এই ছিল তাঁদের মত। লাহোরে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন স্বয়ং বাদশা খান। সভাপতির ভাষণে তীব্র নিন্দা করেছিলেন সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নির্বাচন ও চাকুরিতে সংরক্ষণ নিয়ে। তাহলেও বহু সংখ্যক মুসলমান শেষ পর্যন্ত জিন্নার দবিকে 'বেদবাক্য' বলে মেনে নিয়েছিলেন। কোন্ সত্যের উপর দাঁড়িয়েছিল জিন্নার 'দ্বিজাতিতত্ত্ব', যেটাকে কোনও হিন্দু মুসলিম যুক্তি দিয়ে কাটতে পারেননি?-

> "হ্যাঁ, কোনও ইংরাজ ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করলেও সে ইংরাজ থেকে যায়, কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সে যুক্তি খাটে না। কারণ এখানে ভিন্ন ধর্ম কেউ গ্রহণ করলে হিন্দুদের চোখে সে ম্লেচ্ছ হয়ে যায়। এবং হিন্দুরা সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অথবা কোনও ভাবেই তার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখে না।"[১২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 229 - 235
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জিন্নার এই কথাকে কেউই খণ্ডন করতে পারেননি। এই সত্যের উপরেই দাঁড়িয়েছিল তাঁর দ্বিজাতি তত্ত্বের বনিয়াদ। 'আমাদের দেশভাগের এটা হল আসল ভিত্তি। জিন্না নিমিত্ত মাত্র'। বলা বাহুল্য, হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথার বলি হয়েছিল ভারতবর্ষের ধর্মান্তরিত তথাকথিত নিম্নবর্গ মুসলমান।

কৃষক-প্রজা আন্দোলন ক্রমে মুসলমান আন্দোলন রূপে প্রতিভাত হল। গয়া বুঝতে পেরেছিল কালকের জমায়েতে হিন্দু চাষী-খাতক অংশগ্রহণ করবে না। গয়ার কথায় সেদিন কেউ কানই দেয়নি। জমায়েতের দিন বশির সাজ্জাদ গয়াকে কোথাও না পেয়ে খুঁজতে বের হল। ততক্ষণে গয়া গ্রামছাড়া। জমায়েতের শুরুতে 'বিস্মিল্লাহ' আর শেষে 'মোনাজাতে' হিন্দু-মুসলিম সাধারণ জনসভায় মুসলমানিত্বের রঙ লাগে। আর জমিদারের নায়েব-গোমস্তারা মুসলমানিত্বের রঙকে আরও চড়িয়ে দিয়ে হিন্দু চাষী-খাতকদের আন্দোলন থেকে সরিয়ে নেয়। তথাকথিত উচ্চবর্গীয় হিন্দু-মুসলমানের বিভাজন নীতির ফলে প্রান্তিক হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে 'চিড়' ধরে। তাদের হৃদয় ভেঙে চুরমান হয়ে যায়। ভাঙন ধরে তাদের আন্তরিকতায়। যে 'ভাঙনে'র কোনো ব্যাখ্যা নেই। পিতৃতুল্য সাজ্জাদের থেকে সন্তানপ্রতিম গয়া 'নীরবে' নিজেকে সরিয়ে নেয়। জনসভার আগের দিন গয়া সেই-যে কোথায় চলে গেল (প্রতিবেশী ইরফান মোল্লার কাছে নাকি বলে গিয়েছিল যে, সে একটা জরুরী কাজে শশুর বাড়ী যাচ্ছে) আর ফিরল না। উপন্যাসেও আর তাকে পাওয়া যায়নি। প্রান্তজনেরা এভাবেই বিপন্ন বিচ্ছেদ বেছে নেয়। সাজ্জাদের হৃদয় ভেঙে ছারখার হয়ে গেল। বশির নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিতে লাগল, 'কাজ সা'রেই আবার ফিরে আসবেনে। না আসে যাবে কনে? গয়া কি আমাগের ছাড়ে থাকতি পারবে'? কি হৃদ্যতা! কত আন্তরিক!

আসলে গৌরকিশোর ঘোষ দেখিয়েছেন নিম্নবর্ণের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো বৈষম্য ছিলো না। তারা একে অপরের পরিপূরক। তাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে, আছে নাড়ীর টান। আগেই বলেছি, নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অত্যাচারে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলমানই এই ধর্মান্তরিত মুসলমান। সমাজ-কাঠামোতে যারা প্রান্তিক (প্রচলিত ধ্যান ধারণায়, উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদ?) হৃদয়ের দিক থেকে তারা অতি উচ্চ। নীচুতলার মানুষের মধ্যে কোনো ভেদ-বৈষম্য নেই, যত গণ্ডগোল উঁচুতলার মানুষের মধ্যে। শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্তরাই সমাজে, রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়েছে। ভারত ভাগ হয়েছে। আর অসংখ্য নিরীহ হিন্দু-মুসলিম প্রান্তজনেরা সেই হিংসার বলি হয়েছে।

Reference:

১. দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ, বাঙ্গলার ইতিহাস, নবভারত, প্রথম প্রকাশ ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৮
২. পাল, বিপিনচন্দ্র, সত্তর বৎসর, কল্পন ২০০৫, পৃ. ২২
৩. ঘোষ, গৌরকিশোর, প্রেম নেই, আনন্দ পাবলিশার্স, কল-০৯, একাদশ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ২২৬
৪. ঘোষ, গৌরকিশোর, জল পড়ে পাতা নড়ে, আনন্দ পাবলিশার্স, কল-০৯, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ২০
৫. ঘোষ, গৌরকিশোর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫১
৬. ঘোষ, গৌরকিশোর, প্রেম নেই, পৃ. ১৮৩
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩-২১৪
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮-২১৯
১০. 'দিনক্ষণ' পত্রিকা ২৫ শে বৈশাখ ১৪০১, আবদুর রাউফ, বাঙালি মুসলমানের মন এবং গৌরকিশোর ঘোষ, পৃ. ৫৭-৫৮
১১. ঘোষ, গৌরকিশোর, প্রতিবেশী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ আগষ্ট ১৯৯৮, পৃ. ৪৪
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২